



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 771 - 776

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

বরাক উপত্যকার লোকসংস্কৃতিতে ‘নৌকাপূজা’ ও ‘ওঝা নৃত্য’ : একটি পর্যবেক্ষণ

ড. প্রিয়া পাল

স্বাধীন গবেষক

Email ID: paulshika9085@gmail.com



Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Manasa,
Boat worship,
Ojha dance,
Barak Velly,
Folk culture,
Guruma.

Abstract

Manasa Puja, also known as 'Boat Puja', is a traditional splendor of Srihatta-Cachar district or Surma Barak Valley. Generally farmers or people of Dhibar community celebrate this puja with divine worship. This puja is celebrated on Maghi or Falguni Shukla of panchami tithi. The Boat worship is commonly observed atleast for five to eight days. Generally in Barak valley, the festival grounds are built over a vast field adjacent to the Nilambazar-Durganagar area. Brahma, Vishnu, Maheshwar, Durga, Lakshmi, Saraswati, a total of 70 gods and goddesses are present as spectators in the worship and observed the dance of Behula. Lakhindar, Chand Saudagar, Sanaka, Behula, Neta and many others also occupy their respective places during the worship. Moreover the role of Manasa plays a significant role in this worship as the worship is majorly related with the worship of Manasa. Boats are prepared by worshipers by using long bamboo, cloth, clay. Every boat is made of 14 cubits in height. The boat is built from three to seven stories. Traditionally, during the eight-day long puja, Manasamangal or Padmapuran readings are performed, accompanied by dance and song sessions. Female eunuchs or hijras - locally known as 'guruma' or 'gurumi' - appear as the main singers of the song. Gurma i.e. Ojha sings songs with leather in hand and dancer's outfit. But now due to their extinction other lower caste people participate as singers in this song. So, a huge pandal for Gayen-Bayen-Ojhas are built in front of the main mandapam. There is a seating arrangement for hundreds of devout spectators. Hope the people of Barak valley will also come forward in an effort to keep this folk cultural boat worship alive.

Discussion

উত্তর-পূর্ব ভারতের মধ্যবর্তী সুরমা বরাক উপত্যকার একটি জনপ্রিয় ও আড়ম্বরপূর্ণ পূজা হল ‘নৌকা পূজা’ - যা মূলত মনসা পূজা। আদিম যুগে মানুষ সর্প দংশনের হাত থেকে মুক্ত হবার অভিপ্রায়ে কোথাও প্রত্যক্ষত সাপকে কিংবা কোথাও তাদের নিয়ন্ত্রক দেবদেবীকে পূজা বা আরাধনা করে সমৃদ্ধি বিধানের জন্য নানান প্রয়াস করে এসেছে। মানুষের আদিম

ধর্মচেতনা উৎস ছিল মূলত ভীতিবোধ। এই ভীতি থেকে উদ্ধারের জন্য নানান বিশ্বাস ও সংস্কারজাত আচার-আচরণের মধ্য দিয়েই বিভিন্ন দেবদেবীর পূজার প্রচলন হয়েছে।

মনসা পূজার প্রচলন শুধু বঙ্গদেশে নয়; সমগ্র বিশ্বজুড়েই বিরাজমান। আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ান, আফ্রিকার আদিম জাতি, চীন, জাপান, মিশর, গ্রীস, রোম, কেল্টিক ও বালটো-স্লাবিক, টিউটন জাতি প্রভৃতি বিভিন্ন দেশ ও জনগোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে সর্পকেন্দ্রিক বিচিত্র সংস্কার ও ট্যাবুভিত্তিক আচরণে ভরপুর। বিজয় গুপ্তের ‘মনসামঙ্গল’ বা ‘পদ্মপুরাণ’ গ্রন্থে ‘Encyclopedia of Region and Ethics’ -এর একাদশ স্কন্ধে ইলিয়ট স্মিথ বলেছেন- ‘পৃথিবীর নানা দেশে সাপকে ঘিরে বিচিত্র সব সংস্কার গড়ে উঠলেও সর্প সংস্কৃতির প্রথম বিকাশ ঘটেছিল প্রাচীন মিশরে আজ থেকে প্রায় তিন হাজার বছর আগে’। ভারতীয় আর্য সংস্কৃতিতে ঋগ্বেদে সর্পের উল্লেখ থাকলেও সর্প পূজার উল্লেখ নেই। কিন্তু অথর্ববেদে সর্পদেবী মনসার তুষ্টি বিষয়ক কিছু মন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। পৌরাণিক মতে সর্পদেবী মনসার পূজা সমাজে প্রচলিত হওয়ার অনেক আগে ভারতের বিভিন্ন স্থানে জীবিত সর্পের পূজার রীতি প্রচলন ছিল। ‘মহারাষ্ট্রের শিরিলা গ্রামের মেয়েরা জীবন্ত সাপের মাথায় সিঁদুর পরিয়ে দেবতাজ্ঞানে পূজা করে থাকে’। কেরালার একটি শিব মন্দিরও একটি জীবিত সর্পকে প্রত্যেক দিন দুধ দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়। সাপ যেমন ভীতির কারণ, তেমনি তার বিপরীতে সাপকে ঘিরে অনেক মঙ্গলজনক ধারণাও লোকায়ত সমাজে বর্তমান। বঙ্গদেশে আজও গ্রামাঞ্চলে ‘বাস্তুসাপ’-কে পূজা করা হয়। অনেক গৃহস্থের ধারণা বাস্তুসাপ আসলে পিতৃপুরুষগণের আত্মা, যাঁরা বংশধরের বাস্তুর রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকেন। এই সাপ বিষধর হলেও সে গৃহস্থের কোন ক্ষতি করে না, বরং তার দ্বারা বাস্তুর মঙ্গল সাধিত হয়। ফলে বাস্তুসাপকে হত্যা করার কোন রীতি নেই’ (১৯৭২, দেশ পত্রিকা - বিজয়গুপ্ত ‘মনসামঙ্গল’ বা ‘পদ্মপুরাণ’)। সাপ যেমন ভীতির কারণ তেমনি তার বিপরীতে সাপকে ঘিরে অনেক মঙ্গলজনক রীতিও লোকায়ত সমাজে বিদ্যমান। জীবন্ত সাপের পূজা ভারতের বিভিন্ন স্থানে আজও বর্তমান, কেউ কেউ এগুলোকে অনার্য সংস্কৃতির অঙ্গ বলে বিবেচনা করেছেন। কারণ অনার্য সংস্কৃতির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য বৃক্ষপূজা। ‘বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস’ গ্রন্থে আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন -

“বৃক্ষের সঙ্গে সর্পের সম্পর্ক অত্যন্ত প্রাচীন ও ব্যাপক। কারণ, উভয়ই উর্বরতাশক্তির প্রতীক। দাক্ষিণাত্যে অশ্বথ বৃক্ষের সঙ্গে সর্পের সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে করা হয়। সেইজন্য অশ্বথ বৃক্ষের নীচে মৃত কিংবা প্রস্তর নির্মিত নাগমূর্তি উপহার দেওয়া হয়- অপুত্রক বা বন্ধ্যা নারীগণ সন্তান কামনা করিয়া অশ্বথতলে নাগমূর্তি উপহার দেয় কিংবা নাগপূজা করিয়া ১০৮ বার সেই বৃক্ষ প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে।”

সর্পপূজায় অশ্বথ বৃক্ষ ব্যতীত ফণিমনসা বা সিজা গাছের (সংস্কৃত নাম শ্মুহীবৃক্ষ) নিবিড় যোগ লক্ষ করা যায়। বাংলায় দীর্ঘদিন ধরে এই গাছটিকে মনসার প্রতিরূপ হিসাবে পূজা করা হয়। তাই আদিম জনসমাজে এই গাছটির গুরুত্ব অনেক। অনার্য দেবী মনসার উৎসের কথা স্বীকার করে ‘বাঙালির ইতিহাস’ (আদিপর্ব) গ্রন্থে প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ অধ্যাপক নীহার রঞ্জন রায় বলেছেন -

“সাপ প্রজনন শক্তির প্রতীক এবং মূলত কৌম সমাজের প্রজনন শক্তির পূজা হইতে মনসাপূজার উদ্ভব, এ তথ্য নিঃসন্দেহ। পৃথিবী জুড়িয়া আদিবাসী সমাজে কোনো-না-কোনো রূপে সর্পপূজার প্রচলন ছিলই। বাংলাদেশে যেসব মনসাদেবীর মূর্তি পাওয়া গিয়াছে তাহার প্রায় প্রত্যেকটিতেই মনসাদেবীর সঙ্গে একাধিক সর্পের ক্রোড়াসীন একটি ফলের এবং কোথাও কোথাও একটি পূর্ণঘটের প্রতিকৃতি বিদ্যমান। ইহাদের প্রত্যেকটিই প্রজনন শক্তির প্রতীক।”

প্রথম থেকেই দেবী মনসা অনার্য গোষ্ঠীদের দ্বারা পূজিত হয়েছেন। মূলত গোপালক, কৃষক ও ধীবর সম্প্রদায়ের দ্বারা মনসা পূজা বিস্তৃতি লাভ করে। পরবর্তীতে তিনি উচ্চ বর্ণ তথা ব্রাহ্মণ সমাজের দ্বারা পূজিত হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে এবং জ্যোতিষ্মোহন সংগ্রহশালায়, ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন, বেঙ্গল-এ এমন পাণ্ডুলিপি রয়েছে যাতে মনসার ঐশ্বরিক জাহাজের বিবরণ এবং কীভাবে তার পূজা সংঘটিত হয় এর বর্ণনা করা হয়েছে। একটি সাক্ষাৎকারে লোকসংস্কৃতি

বিশেষজ্ঞ ড: অমলেন্দু ভট্টাচার্যের কথায় জানা যায় - ‘ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের একটি নির্দিষ্ট কিংবদন্তিতে রয়েছে যে মনসা শিবের কন্যা নন। তাকে ঋষি কাশ্যপের মনজতোনা (হৃদয়ের ইচ্ছা) হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। কারণ তিনি একটি কন্যার কামনা করেছিলেন যখন তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তখন তার নাম রাখা হয় মনসা’।

মনসা পূজার পশ্চাতে নানান ভৌগোলিক কারণ নিহিত রয়েছে। বরাক উপত্যকার সিংহভাগ জুড়ে আছে পাহাড়, অরণ্য, চা-বাগিচা। অরণ্য সংকুল এই এলাকায় মানুষের বসবাস থাকলেও তাদের জীবনে কোন নিরাপত্তা নেই। এই প্রতিকূল পরিবেশ মানুষকে জীবনসংগ্রামী করে তোলে। দেখা যায় শনবিলের ধীর সমাজের মানুষ মৎস্য শিকারে বের হলে তখন নানা বিপত্তির সম্মুখীন হয়। বর্ষা, প্রচণ্ড শীত, গ্রীষ্মের দিনে কিংবা গভীর রাতে সংগ্রাম চালায় বরাকপারের মানুষ- তাই নিজেদের রক্ষার জন্য নানান লৌকিক দেব-দেবীর আরাধনা শুরু করে। মনসা, বাদশা, কঙ্কি নারায়ণ, ভৈরব, রূপসী, জংলা মা, কাঁচাকান্তি ইত্যাদি নানান দেবদেবীকে মানুষ ভক্তিভরে পূজা করতে থাকে। যাদের মধ্যে অন্যতম মনসা বা বিষহরি। জাগুলি, পদ্মোভবা, বিষহরি, সিদ্ধযোগিনী, পল্লগী, জাঙ্গুলী, পদ্মাবতী, কমলাবতী ইত্যাদি একাধিক নামে পূজিতা দেবী মনসা - আবার বরাক উপত্যকায় তিনি বিষহরি নামেও পরিচিত। এই বিষহরি নামের পূর্বে ‘ডরাই’ বিশেষণটি যুক্ত হয়ে তিনি চতুর্ভুজরূপে বরাক উপত্যকায় পূজিত হন, কারণ ‘ডর’ বা ‘দহে’ যে ‘আই’ বা মায়ের আবির্ভাব হন তিনিই ডরাই। কচ্ছপ বা কূর্ম হলো তার বাহন। ত্রিলোচন বিশিষ্ট এই দেবীর চার হাতে চারটি সর্প- অনন্ত, বাসুকি, তক্ষক ও কৰ্কট। এছাড়াও বাকি চারটি নাগ হল পদ্ম, মহাপদ্ম, শঙ্খ ও কুলিক। যেহেতু বিষধর সাপের মাথায় মহা মূল্যবান রত্ন থাকে বলে বিশ্বাস তাই পদ্ম বা লক্ষ্মীর অষ্টনীতি পদ্মা-বিষহরি-মনসার অষ্টনাগে পরিণত হয়েছে। ডরাই বিষহরি মূর্তিতে চন্দ্রবদনা ও মাতুরূপা। কান্তাময়ী মনসা দেবীর কূর্ম আসন সম্পর্কে একটি লোকশ্রুতি আছে যে কামাসক্ত মহাদেবের বীর্য ধারণ করার মত শক্তি যখন কারো ছিল না তখন পাতালস্থ কূর্ম সেই বীর্য পৃষ্ঠে ধারণ করেছিলেন। তাই শিবের ঔরসজাত কন্যা মনসা কুর্মবাহিনী।

নৌকা পূজার প্রচার মধ্যযুগের মনসামঙ্গল থেকেই। শিব ভক্ত চাঁদসদাগর তাঁর সাতপুত্রের জীবন এবং ধন-সম্পদের পরিবর্তে একপ্রকার বাধ্য হয়েই মনসা পূজা করেছিলেন। তিনি কখনো মনসাকে নিজের আরাধ্যা দেবী হিসাবে গ্রহণ করেননি বরং তিনি তার ব্যবসা এবং ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য পূজা করেছিল- যাতে তিনি নৌবাণিজ্য কোন বাঁধার সম্মুখীন না হন।

বরাক উপত্যকায় নৌকা পূজায় সর্পদেবী মনসার পূজা হলেও এখানে বিভিন্ন দেব-দেবী পূজিত হন। মাঘী বা ফাল্গুনী শুক্লাপঞ্চমীতে প্রথাগতভাবে এই পূজা হয়। উল্লেখ্য পদ্মপুরাণ কাব্যে দেখা যায় ফাল্গুন মাসে এই পূর্ণ তিথিলগ্নে চাঁদসদাগর চৌদ্দ ডিঙ্গা নিয়ে বাণিজ্য যাত্রা করেছিলেন -

“বাইল উত্তরে বাত ফাগুন যে মাসে।

চান্দে ডিঙ্গা চালাইল লক্ষার উদ্দেশ্যে।”^৩

অবশ্য অপর শুক্লাপঞ্চমীতেও এই পূজা নিষিদ্ধ নয়। ৫ কিংবা ৮ দিনব্যাপী বরাক উপত্যকার বিভিন্ন প্রান্তে নৌকা পূজা আড়ম্বরপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়। দেখা যায় করিমগঞ্জ জেলার নিলামবাজারে সুবিশাল কৃষিমাঠ জুড়ে নৌকাপূজা হয়েছিল। ভারত সেবাশ্রম সংঘের মুখ্য সংগঠক স্বামী সাধনানন্দজি মহারাজ প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী আরো অনেক দেব দেবীরা - যারা দেবসভায় বেহুলা নৃত্যের দর্শক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তাদের মূর্তি ছিল যথাস্থানে। সঙ্গে মনসামঙ্গলের সঙ্গে সম্পৃক্ত লক্ষ্মিন্দর, চাঁদ সদাগর, বেহুলা, সনকা, নেতা প্রভৃতিরও অধিষ্ঠিত রয়েছেন। নৌকাকৃতি মন্ডপটি আনুমানিক তিনতলা থেকে সাততলা অর্ধি দীর্ঘ। সাতটি সিঁড়ির সমন্বয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সগুঁড়িগা মধুকরের উপরে অধিষ্ঠিত রয়েছেন ৮০ জন দেবদেবী এবং সঙ্গে স্থান পান দাঁড়ি-মাঝি-মোল্লারাও। এদের প্রত্যেকে পূজিত হন আলাদা আলাদাভাবে। দেব সভায় মনসার কথায় বেহুলা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন যে শ্বশুর চাঁদ সদাগরকে দিয়ে মনসা পূজা করাবেন। পরিবর্তে মনসাও চাঁদ সদাগরের সগুঁড়িগা ভাসিয়ে দেন এবং পুত্রদের প্রাণ দান করেন-

“পদ্মা বলে মোর দুঃখ কেহ নাহি বুঝে।

না জিয়াব বালকে যাবত নাহি পূজে।।
সভার সাক্ষাতে বালী করুক অঙ্গীকার।
শ্বশুরের হস্তে পূজা करावे আমার।...
অঙ্গীকার করি বালী বলে দেবতারে।
দয়াইব ফুল জল শ্বশুরের করে।”^৪

নৌকাস্থিত অন্যান্য দেবদেবীর মূর্তির তুলনায় মনসা মূর্তিটি বৃহত্তর। উপবিষ্ট অবস্থায় মনসার উচ্চতা সাত থেকে আট ফিট এবং পার্শ্ববর্তী মূর্তিগুলো দন্ডায়মান অবস্থায় দুই থেকে তিন ফিট। পার্শ্বক্য শুধু আকারে নয়, পূজাতেও প্রকাশ পায়। পূজা করেন সাধারণ ব্রাহ্মণরাই। পূজা চলাকালীন নৃত্যগীত সহকারে ‘পদ্মপুরাণ’ পাঠ হয়। মধ্যযুগীয় কবি বিদ্যাপতির ‘ব্যাড়ীভক্তি তরঙ্গিনী’-তে বর্ণিত মনসা পূজা প্রসঙ্গে রয়েছে, ‘পূজায়েদ গীত নর্তনৈঃ’ অর্থাৎ নৃত্যগীত সহযোগে এই পূজা করতে হবে। তাই সুরমা বরাকে বায়েন-গায়েন, ওঝানৃত্য বা গুর্মিনাচ অপরিহার্যভাবে আয়োজিত হয়ে থাকে। এরা মূলত নারী বেশধারী নপুংসক বা হিজড়া, স্থানীয় ভাষায় এদের বলা হয় ‘গুরমা’ বা ‘গুরমি’ (gurma/gurmi)। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ড: সুজিত চৌধুরী বলেছেন -

“Each of five days a professional singer (along with his colleagues) would recite Manasa Mangal popularly known as ‘Padma Purana’. These singers or originally a class of eunuchs called ‘gurma’ or ‘gurmi’ by the natives.”^৫

ধর্মীয় সাধন-সংগীত ওঝা গান প্রধানত দুটি ভাগে বিভক্ত - আচার মূলক এবং লৌকিক। তার প্রথম ভাগে পড়ে ওঝা নাচ, কারণ এ গান গুরু-শিষ্য পরম্পরায় চলে আসছে। দ্বিতীয়ত, নিজস্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে এর প্রচার ঘটে। ওঝানৃত্যে প্রধান ভূমিকায় পালনকারীরা চামর এবং নর্তকীর বেশে সুসজ্জিত হয়ে অনুষ্ঠানে ‘গুরমা’ হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। তাই এই সঙ্গীতানুষ্ঠানের নাম ওঝা গান। শ্রদ্ধেয় মুকুন্দ দাস ভট্টাচার্য এ প্রসঙ্গে বলেছেন -

“ওঝা নৃত্যশিল্পীর হাতে দুটি চামর অবশ্যই ধারণ করতে হয়। কখনো তা হাতে ধরে, কখনো কজিতে বেঁধে ঝুলন্ত অবস্থায় রাখা হয়, তখন বাহু দ্বারা সঞ্চালিত হয়ে নানা মনোভাব প্রকাশ করে।”^৬

তবে বর্তমানে এদের অবলুপ্তির ফলে নিম্ন সম্প্রদায়ের লোকেরাও ওঝার ভূমিকা পালন করে।

ওঝা নৃত্যে ৭ থেকে ৮ জন বা তার চাইতে বেশি সংখ্যক শিল্পীর দল থাকে। কিন্তু এদের মধ্যে থাকেন একজন প্রধান বা দলপতি। বাকিরা দোহার দেন। ওঝা নৃত্য শুরু হয় বন্দনা দিয়ে। প্রথমে গণেশ বন্দনা, এরপর সরস্বতী বন্দনা, মনসা বন্দনা, গুরু বন্দনা, দিক বন্দনা, আসর বন্দনা ইত্যাদি। কখনো আবার মনসা বন্দনা দিয়ে ওঝা নৃত্য শুরু হয়। শিল্পী কখনো আসরে বসে পাঁচালি, লাচাড়ি ইত্যাদি সুরে কাহিনি বর্ণনা করে যান। এর মধ্যে পড়ে সর্পচলন, ময়ূরচলন, হংসচলন, খঞ্জনগমন, দৃষ্টিভেদ ইত্যাদি। এদের পোশাকও বিচিত্র ধরনের। লাল কিংবা হলুদ আরো বিভিন্ন রঙের লম্বা কুচিযুক্ত লম্বা ঘাগরি। লম্বা হাতায়ুক্ত সাদা পাঞ্জাবি ও মাথায় সাদা পাগড়ি, কপালে চন্দনের ফোঁটা, কানে কুন্তল, পায়ে নূপুর পরিহিত। গলায় থাকে বিভিন্ন রঙের হার এবং হাতে কালো রঙের চামর। ওঝা শিল্পীদের বিশ্বাস যে স্বর্গে দেবসভায় ঊষা এবং অনিরুদ্ধ এ ধরনের পোশাক পরিধান করে নৃত্য করতেন। মর্ত্য থেকে অভিশাপমুক্ত হয়ে স্বর্গে পুনরায় যাত্রাকালে দেবী মনসার গান করার জন্য ওঝা শিল্পীদের উদ্দেশ্যে এই ধরনের পোশাক রেখে যায়। তবে বর্তমানে এ ধরনের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

ওঝা নৃত্য সম্পূর্ণভাবেই গুরু পরম্পরা ধারার নৃত্য। ৬/৭ বছর বয়স থেকেই শিশুরা ওঝার আশ্রয়ে এসে এই নৃত্য আয়ত্ত করে থাকে। একাগ্রতা, স্মৃতিশক্তির প্রখরতা, অভিনয় ইত্যাদি নানান গুণাবলী বিচার করে গুরু শিষ্য নির্বাচন করেন। তবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে এদের প্রচার এবং প্রসার অনেকটাই কমে এসেছে। ভক্ত বা দর্শক শ্রোতাদের মনোরঞ্জননের জন্য ওঝা নৃত্যে আধুনিকতার ছোঁয়া লক্ষ করা যায়। যেমন- ধর্মীয় সংস্কার নয় এখানে দর্শক মনোরঞ্জন-ই

প্রধান, কালো চামরের পরিবর্তে সাদা চামর, নৃত্যের শুরুতে বন্দনার পরিবর্তে কখনও সরাসরি শুরু হয়। তবে ওঝা নৃত্যের এই নতুন রূপ দানের পিছনে শিলচর সংগীত বিদ্যালয়ের ভূমিকা অপরিহার্য। কবি ষষ্ঠীবর দত্তের কাব্যে নব আঙ্গিকের ছোঁয়া ওঝা নৃত্যে পাওয়া যায়। যেমন- বেহুলার নৃত্য-গীতে -

“ও নাচেরে...

আরে ও

নৃত্য করে শাহের কুমারী, মরি হায়রে

নৃত্য করে শাহের কুমারী

ও তোমরা দেখোগো আসি

ভালা নৃত্য করে শাহেরও কুমারী।”^৭

গানটির মধ্যে ওঝা নৃত্যের বিভিন্ন কলা-কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে যিনি মূল ওঝা তিনি বেহুলার ভূমিকা অবতীর্ণ হয়ে বন্দনা গান দিয়ে নৃত্য শুরু করেন-

“বন্দি মাগো সরস্বতীর চরণ যুগল

(মাগো) দ্বিতীয়ে বন্দি আমি যত দেবগণ।

তৃতীয়ে বন্দীনি আমি গুরুর চরণ

সর্বশেষে বন্দী আমি উপস্থিত জন।”^৮

দেখা যায় উত্তরবঙ্গেও মনসা ভাসান গানের বন্দনা অংশে সরস্বতীর উল্লেখ রয়েছে-

“প্রথমে বন্দনা করং দেবী সরস্বতী

দ্বিতীয় বন্দনা করং দেবগণপতি।”^৯

বরাক উপত্যকার নিলামবাজারে নৌকা পূজার আয়োজনকে ঘিরে ব্যাপক উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত ২৫০ জন পুরুষ-মহিলা বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে নদী থেকে ৮০টি মঙ্গলঘট পূর্ণ করে টিকরপাড়ায় ফিরে যান। এছাড়াও এলাকায় দুস্থদের বিনামূল্যে চিকিৎসা ও বস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। জানা যায়, করিমগঞ্জের এক প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীকে মা মনসা স্বপ্নাদেশে নৌকা পূজার আদেশ দেন। মূলত তার প্রচেষ্টাতেই পূজার আয়োজন। সঙ্গে ছিলেন আয়োজক কমিটির জ্যোতিষ্মান পুরকায়স্থ, সম্পাদক রাজু পাল, কোষাধ্যক্ষ মনোজ কুমার দেব সহ স্থানীয় জনগণ। যাদের সম্মিলিত প্রয়াসে নৌকা পূজা জাঁকজমকপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রসাদ বিতরণের জন্য গড়ে তোলা হয়েছিল সুবিশাল প্যান্ডেল। হাজার হাজার ভক্তের সমাগমে অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে আয়োজিত বৃহৎ ধর্মানুষ্ঠান তথা ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের নিষ্ঠা ও ঐতিহীন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। আশা করি লুপ্তপ্রায় এই ওঝা নৃত্য ও নৌকাপূজা বরাক উপত্যকায় আরো অনুষ্ঠিত হবে এবং সুধীজনদের উদ্যোগে এই লোকসংস্কৃতির চর্চা এগিয়ে যাবে ও সঙ্গে বরাক উপত্যকার ঐতিহ্যপূর্ণ লোকঐতিহ্যের ধারাকে সমৃদ্ধ করবে।

Reference:

১. নস্কর, সনৎকুমার (ভূমিকা), বিজয় গুপ্তের ‘মনসামঙ্গল’ বা ‘পদ্মপুরাণ, জানুয়ারি, ২০২৩, প্রজ্ঞা বিকাশ, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৯, পৃ. ৩৯
২. তদেব, পৃ. ৪২
৩. চক্রবর্তী, অজিতকুমার, ‘নৌকা পূজা- শ্রীহট্ট-কাছাড়ের এক বিশেষ ধরনের মনসা পূজা’, Retrieved from <https://www.facebook.com/share/p/15XKcKu9xk/>, Time-12:40 PM; Date-04/10/2024
৪. তদেব
৫. তদেব

-
৬. বসু, ড. শিবতপন, 'বরাক উপত্যকার লোকসংস্কৃতি', ২০০১, গ্রাফিক্স প্রিন্টিং, আর. পি. রোড; হাইলাকান্দি (অসম)-৭৮৮১৫৫, পৃ. ২০৭
৭. ভট্টাচার্য, ড. বিশ্বজিৎ (প্রধান সম্পাদক); 'Pratidhwani the Echo', বর্ষ : ২, সংখ্যা : ২, দেব, সূর্যসেন (প্রাবন্ধিক), 'বরাক উপত্যকার লোকনৃত্যে বিশ্বায়নের প্রভাব : প্রসঙ্গ ওঝানৃত্যের নবআঙ্গিক', অক্টোবর, ২০১৩, বাংলা বিভাগ, করিমগঞ্জ কলেজ, করিমগঞ্জ-৭৮৮৭১০, পৃ. ৩৬
৮. বসু, ড. শিবতপন, 'বরাক উপত্যকার লোকসংস্কৃতি', ২০০১, গ্রাফিক্স প্রিন্টিং, আর. পি. রোড; হাইলাকান্দি (অসম)-৭৮৮১৫৫, পৃ. ২০৬
৯. তদেব, পৃ. ২০৬